রাম্বুটান চাষে প্রবাসফেরত আফজাল শেখের ভাগ্যবদল

কৃষি ডেস্ক

মো. আফজাল শেখ (৩৬) গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের কলাপাটুয়া গ্রামের পরিচিত নাম। একসময়ের মালয়েশিয়া প্রবাসী এ যুবকের এই পরিচিতির পেছনে লুকিয়ে আছে সংগ্রাম, স্বপ্ন আর সাহসের গল্প।

জানা যায়, ২০১৮ সালে মালয়েশিয়ায় রংমিস্ত্রির কাজ করতেন আফজাল। জীবিকার তাগিদে বিদেশ গেলেও তেমন ভালো কিছু করতে পারছিলেন না। একসময় সিদ্ধান্ত নেন, ফিরে আসবেন দেশের মাটিতে। দেশে ফিরে কী করবেন? কীভাবে চলবে পরিবার? প্রশ্নগুলো অস্থির করে তোলে তাকে।

প্রবাসে থাকা অবস্থায় ইউটিউবে ভিডিও দেখে ‘রাম্বুটান’ নামের বিদেশি ফলের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় জনপ্রিয় এ ফলের চাষের পদ্ধতি বিষয়ে জানতে শুরু করেন। ২০১৮ সালের শেষদিকে দেশে ফিরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন মাত্র চারটি রাম্বুটানের চারা।

বাড়ির উঠানে চারটি গাছ রোপণ করেন তিনি। একটি গাছ বাঁচাতে পারেননি। বাকিগুলো টিকে যায়। জীবিকা নির্বাহের জন্য আবারও রংমিস্ত্রির কাজে যুক্ত হন। পাশাপাশি গাছগুলোকে যত্ন করেন। প্রথম কয়েক বছরে ফলন আশানুরূপ না হলেও হাল ছাড়েননি। যোগাযোগ করেন স্থানীয় কৃষি অফিস ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মেনে শুরু করেন পরিচর্যা। এর ফলও পেতে শুরু করেন আফজাল শেখ। এ বছর তার বাড়ির তিনটি রাম্বুটান গাছে বাম্পার ফলন হয়েছে। প্রতিদিনই পাইকার ও খুচরা ক্রেতারা ভিড় করছেন বাড়িতে। প্রতি কেজি ১,২০০ থেকে ১,৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে বিদেশি সুস্বাদু এ ফল। শুধু ফল বিক্রিই নয়; চারা বিক্রিতেও আয় করছেন। অনেক আগ্রহী কৃষক তার কাছ থেকে চারা সংগ্রহ করে রাম্বুটান চাষ করছেন।

মাছের ঘেরে তরমুজ চাষ কৃষকের মুখে হাসি

কৃষি ডেস্ক

দূর থেকে দেখলে মনে হবে সবুজ পাতার ছায়ায় ঝুলছে রঙিন ফলের মালা। কাছে গেলে বোঝা যায়, এগুলো অসময়ের তরমুজ। নিচে মিঠে ও লোনা পানির মিশ্র ঘেরে মাছের খেলা। ওপরে মাচায় ঝুলছে সুপ্রিম হানি, তৃপ্তি, ব্ল্যাক বেবি, সুগারকুইন আর বাংলা লিংকের তরমুজ। এ মন ভোলানো দৃশ্য এখন সাতক্ষীরার দেবহাটার কৃষি মাঠে নতুন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

কয়েক বছর আগেও দেবহাটার মৎস্য ঘেরের ভেড়িগুলো ছিল অব্যবহৃত বা স্রেফ আগাছায় ভরা। কৃষি বিভাগের উদ্যোগে সেই ভেড়িগুলোতে শুরু হয় পরীক্ষামূলক তরমুজ চাষ। প্রথমে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, লোনা পানির প্রভাবে কি তরমুজ হবে? তবে প্রথম ফসলেই মিললো সাফল্য। সেই সাফল্য ছড়িয়ে পড়লো আশপাশের গ্রামগুলোতে।

দেবহাটা উপজেলা কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর প্রায় ৫০ জন কৃষক এ চাষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আলাদা জমির দরকার নেই। মাছের ঘেরের ভেড়ি আর সামান্য জমিই যথেষ্ট। ফলে বিনিয়োগ কম, ঝুঁকি কম আর লাভ অনেক।

এখন বাজারে কেজিপ্রতি তরমুজ বিক্রি হচ্ছে ৭০-৮০ টাকা দরে। মৌসুমের বাইরে এত দাম পাওয়ায় কৃষকদের চোখেমুখে খুশির ঝিলিক। উপজেলার তিনটি প্রদর্শনী প্লটে এরই মধ্যে বাম্পার ফলন এসেছে। কৃষি বিভাগ থেকে উন্নত জাতের বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়েছে। যার মধ্যে সুপ্রিম হানি, তৃপ্তি, ব্ল্যাক বেবি, সুগারকুইন ও বাংলা লিংক আছে।

টিকেট গ্রামের চাষি বিশ্বনাথ টাপালী বলেন, ‘লোনা এলাকায় টিউবওয়েলের পানি বালতিতে করে এনে প্রতিদিন গাছে পানি দিই, রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ করি। কষ্ট অনেক কিন্তু ফল মিষ্টি। প্রথম চালানেই ৪০ হাজার টাকার তরমুজ বিক্রি করেছি। আরও দুই দফা তোলা বাকি।’

কৃষক আবুল কাশেমের অভিজ্ঞতা আরও উজ্জ্বল। তিনি বলেন, ‘তরমুজ দেখতে সুন্দর, খেতেও অসাধারণ মিষ্টি। বাজারে চাহিদা প্রচুর। আশা করছি প্রায় ২ লাখ টাকার তরমুজ বিক্রি করতে পারবো।’

উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোস্তফা মোস্তাক আহম্মেদ বলেন, ‘লোনাতে সোনার খোঁজে কাজ করছি আমরা। প্রথমে কৃষকদের আগ্রহ কম ছিল। এখন নিজেরাই এসে বীজ চাইছেন।’

দেবহাটা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শওকত ওসমান বলেন, ‘যেখানে আগে ভেড়ি পতিত থাকতো; সেখানে এখন ফসল হচ্ছে। এতে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে। কৃষকের আয় বাড়ছে আর স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে।’

দেবহাটার অসময়ের তরমুজ চাষ শুধু কৃষকের ভাগ্যই বদলাচ্ছে না, পতিত জমি ও লোনা পানি নিয়েও কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে। হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে এ মডেল সাতক্ষীরা ছাড়িয়ে দেশের অন্য উপকূলীয় অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়বে।

ছাদে বা টবে কিভাবে চাষ করবেন

কৃষি ডেস্ক

বর্তমানে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে বাড়ির ছাদে বাগান করা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অধিকাংশ বাড়ির ছাদের দিকে তাকালেই বিভিন্ন ধরনের বাগান দেখা যায়। অবশ্য রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরের ছাদে যেসব বাগান দেখা যায় তার অধিকাংশই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নেয়া হলে বাড়ির ছাদে যেকোন গাছ, এমনকি শাকসবজিও ফলানো সম্ভব। আঙুর, বেদানা, ডালিম, আমড়া, পেয়ারা ইত্যাদি নান ধরনের মৌসুমী ফল ছাড়াও কলমি শাক, কলা, ডাঁটা, লাউ ইত্যাদি অনায়াসে উৎপাদন করা যায়। কোন গাছের জন্য কি ধরনের মাটি উপযোগী তা নিশ্চিত হয়ে ছাদে বাগান করলে ভাল হয়। এ ছাড়া বেশি রোদ বা গরম সহ্য করতে পারে এমন গাছই ছাদে বপন করা উত্তম। ছাদে বাগান করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিয়মিত পানি সেচ দেয়া। কারণ, বাগানের গাছগুলো যেহেতু সাধারণ মাটির সংস্পর্শ হতে দূরে থাকে তাই নিয়মিত পানি সেচ না দিলে গাছগুলো যেকোন সময় মারা যেতে পারে। সাধারণত দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে গাছ ভাল জন্মে। ছাদে বাগান করতে হলে এ ধরনের মাটি ব্যবহার করলে ভাল হয়।

শখ করে আমাদের দেশে ছাদে বাগান করার প্রথা শুরু হলেও এখন রীতিমত অর্থনৈতিক খাত হিসেবে চিহ্নিত। অনেকেই আছে যারা বাড়ির ছাদে বাগান করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করে।

ছাদে বাগান করতে হলে প্রতিদিন সকাল-বিকাল গাছে পানি দিতে হবে। গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া মাটির ধরণ জেনে বাগান করলে ছাদে যেকোন ধরনের গাছই জন্মানো সম্ভব। ৪-৫ কাঠা জমির উপর বাড়ির ছাদে পরিকল্পিতভাবে বাগান করলে পরিবারের চাহিদা পূরণ করেও বছরে বিক্রি কর যায় ৪০-৫০ হাজার টাকা। ইচ্ছে করলেই শহরবাসী ফলের বাগান বা সবজি বাগান করতে জমি পান না। তাই বিকল্প উপায় বের করে আবাদি জমি নষ্ট না করে ছাদকে কাজে লাগিয়ে বাগান করা যায়। পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বিকল্প আয়ের উৎস হতে পারে এই ছাদে বাগান যা পরিবারকে করবে স্বচ্ছল।

ছাদে বাগান: বিস্তারিত তথ্য

বিশাল বাংলার জমিন যেমন বিস্তৃত, তেমনি লাখোকোটি দালান ঘরের ছাদও অবারিত বিস্তৃত। যদিও বাংলার জমিন এখনো যথোপোযুক্তভাবে ব্যবহার হচ্ছে না। সেখানে ছাদের কথা তো আরও পরে আসে। কিন্তু এ দেশের কিছু আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ আছেন যারা ব্যক্তিগত আগ্রহ আর উদ্যোগে ছাদে বাগান করেন শখের বসে। বিনিয়োগের যেমন হিসাব থাকে না, তেমনি প্রাপ্তির হিসেবেও তেমনভাবে করা হয় না শখের ছাদের বাগানে। অথচ সামান্য আন্তরিকতা আর সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে এ প্রতিশ্রুতিশীল দিকটাকে অনেকদূর নিয়ে যেতে পারি। ছাদে বাগান করে ছাদের সৌন্দর্য যেমন বাড়ে, তার সাথে জায়গাটুকু ব্যবহার করে পরিবারের ফুল, শাকসবজি ও ফলের চাহিদা যথাযথভাবে মেটানো যায়। শুধু কি তাই পরিকল্পিতভাবে ছাদে বাগান করে বাড়তি আয়ও করা যায়। সর্বোপরি ছাদের বাগানে পরিবারের অবসরপ্রাপ্ত আগ্রহী লোকগুলো দারুণভাবে সময় কাটাতে পারেন। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

বাগান পদ্ধতি ছাদে বাগান দু’ভাগে করা যায়। যেমন কাঠ বা লোহার ফ্রেমে এঁটে বেড তৈরি করে এবং অন্যটি হলো টব, ড্রাম, পট কনটেইনার এসব ব্যবহার করে। প্রথম ক্ষেত্রে পুরো ছাদ বা ছাদের অংশবিশেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্নিশের পার্শ্বে বা আলাদা ফ্রেম করে সুন্দরভাবে ডিজাইন করে সেটিং করা যায়। এ ক্ষেত্রে জল ছাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জল ছাদ না থাকলে আলাকাতরার প্রলেপ দিয়ে তার ওপর মোটা পলিথিন বিছিয়ে তার ওপর মাটি দিতে হবে। মনে রাখতে হবে মাটির পুরুত্ব যত বেশি হবে। অন্তত দু’ফুট পুরু মাটির স্তর থাকতে হবে। তবে যত বেশি তত ভালো। অতিরিক্ত পানি, সার পাবার সুষ্ঠু পথ রাখতে হবে। পরবর্তীতে প্রয়েঅজনীয় পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে। ফ্রেম তৈরির ক্ষেত্রে কাঠ, লোহা, স্টিল, মোটা রবার এসব ব্যবহার করা যায়। তবে যা কিছু দিয়ে বা যে ভাবেই বেড তৈরি হোক না কেন ৩/৪ বছর পর পুরো বেড ভেঙ্গে নতুন করে তৈরি করতে হবে। এতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ছাদে বাগানের জন্য শুরুতেই যদি মাটিকে ফরমালডিহাইড দিয়ে (প্রতি লিটার পানির সাথে ১০০ মিলিলিটার ফরমালডিহাইড) শোধন করে নেয়া যায় মাটি শোধনের কৌশল হলে প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি নিয়ে বর্ণিত মাত্রায় ফরমালডিহাইড মিশ্রিত পানি মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে পুরো মাটিকে মোটা পলিথিন দিয়ে ৩/৪ দিন ঢেকে রাখতে হবে।

হারিয়ে যাচ্ছে দেশি ফল ‘খেজুর’

কৃষি ডেস্ক

গ্রামবাংলার পরিচিত ফল দেশি খেজুর। গ্রামের ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠা যেসব গ্রামীণ ফল খেয়ে; তারমধ্যে খেজুর অন্যতম। ছোটবেলায় খেজুর বলতে ২ ধরনের খেজুরকে বোঝানো হতো। যেটি দেশি খেজুর; সেটি শুধু খেজুর। কিনে আনা খেজুরকে বলা হতো সৌদির খেজুর। কোনো কোনো অঞ্চলে বলা হতো ‘খুরমা খেজুর’।

সাধারণত খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করার পর গাছে ফুল ধরে। সবুজ রঙের ফল হয়। পরে হালকা হলুদাভ রং থেকে পরিপক্ব হওয়ার সময়ে গাড় কমলা রং ধারণ করে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এ ফল পাকা শুরু করে। তখন গাছের তলায় ঝরে পড়ে। লোকজন গাছের তলা থেকে প্রথমদিকে খেজুর সংগ্রহ করে। এ ছাড়া পাখির আনাগোনা শুরু হয়। পাখিতে প্রচুর পরিমাণে খেজুর খেয়ে থাকে।

একটি খেজুর গাছে ৫-৭টি ছড়া বা তার বেশিও ছড়া হয়ে থাকে। কখনো কখনো এর কমও হতে পারে। কিছু খেজুর আষাঢ় মাসের দিকে পাকা শুরু করে। শ্রাবণ মাস পর্যন্তও এ খেজুর পাওয়া যায়। গাছের তলা থেকে সংগ্রহ করা ছাড়াও মানুষজন ছড়া কেটে কলা পাতায় পেঁচিয়ে পানিতে বা পুকুরে একদিন ডুবিয়ে রাখে। যাকে আঞ্চলিক ভাষায় ‘জাগ দেওয়া’ বলে।

গাছ থেকে ছড়া কেটে ঘরে রেখে দিলেও ২-৩ দিনের মধ্যে পেকে যায়। পাকলে এ ফল অত্যন্ত মিষ্টি হয়। মেরুন রং ধারণ করে। ফলের ওপরে পলিথিনের মতো পাতলা আবরণ এবং ভেতরে নরম বেলে বেলে শ্বাস হয়। ফলের বীজ বেশ লম্বা হয়। বরিশাল অঞ্চলে খেজুরের সাথে মুড়ি দিয়ে মোয়াও তৈরি করা হয় ঘরোয়াভাবে।

যখন এ ফল কাঁচা সবুজ রঙের থাকে; তখন গ্রামের ছেলেমেয়েরা ফলের বীজ দিয়ে গুটি নামক খেলা খেলে মাটিতে ঘর কেটে। এ ছাড়া কাঁচা ফলও কেউ কেউ মুখে রেখে চিবায়। যার স্বাদ কষযুক্ত। বীজগুলো তখন নরম হয়। চিবালে কটকট করে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, খেজুরে ভিটামিন এ, সি, কে, আয়রন, বিটা-ক্যারোটিন, ক্যালসিয়ামসহ বিভিন্ন উপাদান থাকে। হৃদরোগের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং মানবদেহে রক্ত তৈরি করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া খেজুর হজমবর্ধক। পাকস্থলি ও যকৃতের শক্তি বাড়াতে সহায়ক। শরীরের রোগ প্রতিরোধের জন্য খেজুর বেশ কার্যকর।

এ গাছের মাতি বা মাথি অত্যন্ত সুস্বাদু। শহরাঞ্চলে এ গাছ দেখা যায় না।

অসময়ে গাছে ঝুলছে বৈচিত্র্যময় আম সায়ন বিক্রিতেই আয় ৫ লাখ টাকা

কৃষি ডেস্ক

আমের মৌসুম শেষ হয়েছে অনেক আগেই। বাজার থেকে হিমসাগর, ল্যাংড়া, ফজলি, আম্রপালি–এক এক করে বিদায় নিয়েছে। এখন শরতের আকাশে সাদা মেঘ ভাসছে। মাঠে ধান, ক্ষেতে নানা ফসল। অথচ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর পৌর এলাকার খয়রাবাদে ঢুকলেই মনে হবে, আমের মৌসুম বুঝি এখনো শেষ হয়নি।সারি সারি গাছের পাতার ফাঁকে ঝুলছে থোকা থোকা আম। কোনো গাছে কাটিমন, কোনো গাছে কল্যাণভোগ। কোথাও আবার এমন কিছু আম, যার জাতের নামও এখনো নিশ্চিত করতে পারেননি বাগানের মালিক। অক্টোবর মাসেও গাছভরা আম দেখে পথচারীদের অনেকেই থমকে দাঁড়ান। কেউ জানতে চান, এখনো আম আছে?তবে এ আমের গল্প অন্য রকম। এই অসময়ের আমের পেছনে গল্প রবিউল ইসলাম রবি। প্রায় তিন দশক ধরে গাছ, চারা, সায়ন ও আমের জাত নিয়ে কাজ করে তিনি গড়ে তুলেছেন ১২ বিঘার এক বৈচিত্র্যময় আমবাগান। তার বাগানে শুধু প্রচলিত জাত নয়; রয়েছে অসময়ে ফলন দেওয়া, দেশের বাইরে থেকে আনা এবং পরীক্ষামূলকভাবে লাগানো নানা জাত।কাটিমন, ক্ষিরসাপাত, গৌড়মতি, ইলামতি, স্যান্ডি, চিয়াইমাই, রেড পালমার, কিং অব চাপাতি, হানিবিউ, বারি-৭, আম্রপালি, বারি-৪ ও কল্যাণভোগ এক বাগানে এত জাতের আমের সমাহারই বলে দেয়, রবির কাজ শুধু আম ফলানো নয়, আমের নতুন সম্ভাবনা খোঁজাও তার নেশা।আর সেই নেশা এখন পরিণত হয়েছে ব্যবসায়িক উদ্যোগে। ২০২৪ সালে কল্যাণভোগের সায়ন বিক্রি করে তার আয় হয়েছিল ৩৪ হাজার ৫০০ টাকা। ২০২৫ সালে তা বেড়ে প্রায় ২ লাখ টাকা। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সায়ন বিক্রি থেকেই আয় হয়েছে প্রায় ৫ লাখ টাকা।তার স্বপ্ন দেশের মানুষ যেন শুধু আমের মৌসুমেই নয়, বছরের বিভিন্ন সময় কম দামে আম খেতে পারেন। আর সেই লক্ষ্যেই তিনি খুঁজছেন নতুন নতুন জাত। গল্পটা শুরু হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। তখন তিনি ছিলেন ছাত্র। ১৯৯৭ সালে এসএসসি পাস করার পরই নার্সারি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। বয়স কম, পুঁজি কম, কিন্তু গাছের প্রতি আগ্রহ ছিল প্রবল।প্রথমে ছিল সাধারণ চারা উৎপাদন ও বিক্রি। এরপর বিভিন্ন জাতের আমগাছ নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। কোন জাতের গাছ কেমন, কখন ফল দেয়, ফলের আকার ও স্বাদ কেমন–এসব জানতে শুরু করেন তিনি। ধীরে ধীরে একটি বিষয় তাকে বেশি ভাবায়। সঠিক জাতের গাছ না হলে কৃষক কাঙ্ক্ষিত ফলন ও লাভ পাবেন না। এই ভাবনা থেকেই মাদার গাছ তৈরির কাজ শুরু করেন রবি।তিনি ভালো জাতের গাছ নির্বাচন করে সেখান থেকে সায়ন সংগ্রহ করতেন। এরপর নতুন গাছে তা গ্রাফটিং করতেন। এভাবে নিজের হাতে তৈরি করেন বিভিন্ন জাতের গাছ। রবি বলেন, ‘১৯৯৭ সালে এসএসসি পাস করার পর ছাত্রজীবন থেকেই নার্সারির ব্যবসা শুরু করি। ধীরে ধীরে সঠিক আমের জাত নির্ণয়ের জন্য মাদার গাছ তৈরি করি। তখন থেকেই বাণিজ্যিক আমের বাগান করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকি।’দেড় বিঘার সেই শুরু২০১৮ সালে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, শুধু নার্সারি নয়– নিজেই বাণিজ্যিকভাবে আমবাগান করবেন। মাত্র দেড় বিঘা জমি লিজ নেন। সেখানে কল্যাণভোগ আমের সায়ন করেন। নিজের হাতে পরিচর্যা করেন গাছগুলো।

এরপর একে একে অন্য জাতের সায়ানও গ্রাফটিং করতে থাকেন।

সবুজের মাঠে ডানা মেলছে হীরামন টিয়া

কৃষি ডেস্ক

হেমন্তের শিশিরভেজা ভোরে সবুজ ফসলের মাঠজুড়ে ডানা মেলছে একঝাঁক রঙিন হীরামন টিয়া। ফসলের মাঠ ও উন্মুক্ত প্রান্তরে দলবেঁধে উড়ে বেড়ানো এই পাখিদের মনোমুগ্ধকর রূপ দেখতে প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে ভিড় করছেন প্রকৃতিপ্রেমীরা। এমনই দৃশ্য দেখা গেছে নওগাঁর বদলগাছি উপজেলার দোনাইল গ্রামের ফসলের মাঠে।

দোনাইল গ্রামের ফসলের মাঠে এখন যেন পাখিদের মিলনমেলা। ভোর থেকেই ক্যামেরা ও ভিডিও ধারণের জন্য নানা সরঞ্জামাদি হাতে নিয়ে মাঠে উপস্থিত হচ্ছেন বিভিন্ন বয়সী পাখিপ্রেমীরা। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, হীরামন টিয়ারা সাধারণত সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই খাবারের সন্ধানে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে দলবেঁধে এরা মাঠে নেমে আসে। আর প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফিরে যায়। এরপর আবার বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে ৪টার দিকে শুরু হয় তাদের দ্বিতীয় দফার বিচরণ, যা চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এদিকে পাখিদের খাবারের জোগান নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন স্থানীয় দোনাইল গ্রামের পাখিপ্রেমী যুবক আরিফ হোসেন।

কৃষিভিত্তিক শিল্পের অভাবে বঞ্চিত কৃষক

কৃষি ডেস্ক

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। দেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তার বড় অংশই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অথচ স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও দেশে পর্যাপ্ত কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, আধুনিক রাইসমিল, হিমাগার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে ওঠেনি। ফলে কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং কৃষি খাতের সম্ভাবনা পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

মাছ: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট মাছ উৎপাদন হয়েছে ৫০.১৮ লাখ মেট্রিক টন, যার মধ্যে ইলিশ উৎপাদন ছিল ৫.২৯ লাখ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে।

বিপুল উৎপাদনের বিপরীতে দেশে এখনো গড়ে ওঠেনি পর্যাপ্ত আধুনিক রাইসমিল ও শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র। হিমাগার ও কোল্ড চেইন অবকাঠামো। ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। ফলে কৃষকেরা বাধ্য হন মৌসুমি দামে পণ্য বিক্রি করতে, যা তাদের আয়কে অনিশ্চিত করে তোলে। অনেক সময় অতিরিক্ত উৎপাদনেও বাজারে দাম পড়ে যায়, কারণ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ নেই। কৃষকের আয় কমে যায়, ফলে তারা কৃষিকাজে আগ্রহ হারায়। বেকারত্ব বাড়ে, কারণ কৃষিভিত্তিক শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে না। রপ্তানি সম্ভাবনা নষ্ট হয়, কারণ আন্তর্জাতিক মানের প্রক্রিয়াজাত পণ্য তৈরি হয় না। বাংলাদেশের কৃষিখাতকে শিল্পায়নের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ কৃষিভিত্তিক শিল্পে উৎসাহিত করা। প্রযুক্তিনির্ভর প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন। কৃষক প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ উন্নয়ন। রপ্তানি ভিত্তিক কৃষি শিল্প গড়ে তোলা। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বিশ্বমানের হলেও এর পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন অপরিহার্য। স্বাধীনতা পরবর্তী এ পর্যন্ত তেমন কোনো রকম কৃষিভিত্তিক কলকারখানা, সবজি ও ফল সংরক্ষণে হিমাগার, কৃষিশিল্প ভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন, এসব নিয়ে তেমন কিছু দৃশ্যমান কৃষক বান্ধব কার্যক্রম হাতে নেয়নি বিগত দিনের সরকারগুলো। পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ, হিমাগার স্থাপন ও পণ্য পরিবহনের সুবিধা না থাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠেনি বলে মত প্রকাশ করেন ব্যবসায়ীরা। আন্তঃজেলার সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা কৃষিবান্ধব করা না গেলে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা হবে না বলে মনে করেন স্থানীয় কৃষকেরা। কৃষিখাতে সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা না গেলে টেকসই কৃষি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠবে না এবং সেই সাথে কৃষকের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

কৃষিভিত্তিক শিল্পের অভাবে আমাদের কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হয় না, ফসলের যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ সীমিত থাকে। ফলে তারা মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যে কারণে কৃষকের পরিশ্রমের সঠিক মূল্য তারা পায় না এবং গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নতির সুযোগ হারায়। কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা হলে শুধু কৃষকের জীবনমান উন্নত হবে না বরং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও টেকসই হবে।